অ্যান্টনি ফ্লু তার প্রবন্ধ ‘The justification of Punishment’ এ শাস্তির পাঁচটি লক্ষণ দেন--

১) প্রকৃত শাস্তির ক্ষেত্রে একটা না একটা অকল্যাণ, একটা না একটা অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত থাকবে। এ অকল্যাণ বা অস্বচ্ছান্দ্য বর্তাবে তার ওপর যে শাস্তিটি পাচ্ছে।

২) শাস্তি সবসময়ই কোন না কোন অপরাধের জন্যে। এ অপরাধ বাস্তবে ঘটে থাকতে পারে, আবার না-ও পারে। এমন হতে পারে যে, অপরাধের ঘটনাটি পুরোপুরি মনগড়া।

৩) শাস্তির তীর সবসময় অপরাধী বলে গন্য ব্যক্তির দিকে।

৪) শাস্তিবিধানের কর্তাকে অবশ্যই ব্যক্তিমানুষ হতে হবে। দণ্ডের কর্তা যদি ব্যক্তিমানুশ না হয়ে প্রাকৃতিক কারণবিশেষ হয় তাহলে এমন দণ্ডকে শাস্তি বলা যাবে না।

---ভূমিকম্পের কারণে বিপর্যয় হলে সেটাকে শাস্তি বলে গন্য হবে না।

৫) শাস্তিবিধানের কতৃত্ব যোগ্য সংস্থায় অর্পিত হওয়া চাই। যে সংস্থায় তৈরী বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে একমাত্র সেই সংস্থাই এ বিধিলঙ্ঘনের শাস্তি দিতে পারে।

ফ্লু এর এই শাস্তিলক্ষণের বিশেষত্ব- শাস্তি দিতে গেলে কিছু না কিছু নিয়ম মেনে শাস্তি দিতে হবে- স্বীকৃত পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য থাকবে।

এই লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দোষ এড়াতে সক্ষম –

---সেই কষ্টভোগ শাস্তি বলে গন্য নয় যা স্বেচ্ছায় বরণ করা হয়েছে। যেরকম মনসমীক্ষায়।

---শাস্তি একমাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় যেসব ক্ষেত্রে কেউ না কেউ অপরাধী হিসেবে অন্তত চিহ্নিত (প্রমাণিত না হলেও চলবে) হয়েছে।

শাস্তিদানের যৌক্তিকতা কী?

প্রতিকারাত্মক তত্ব, প্রতিরোধাত্মক তত্ব, সংশোধনাত্মক তত্ব

প্রতিকারাত্মক তত্ত্বঃ

একটা অপরাধের প্রতিকার করা হয় অপরাধীকে সেই অপরাধের তুল্যমুল্য উচিত শাস্তি দিয়ে।

ক যদি খ-কে খুন করে তাহলে তার শাস্তি হিসাবে ক-এর মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য হবে, তার চেয়ে কম কোন শাস্তি নয়→ উচিত শাস্তি।

শাস্তি মুলত প্রতিকারাত্মক- প্রথমেই দেখতে হবে, এ শাস্তি দিয়ে অপরাধের যথাযথ প্রতিকার হচ্ছে কি না। অর্থাৎ অপরাধী তার শিকারকে যতখানি যন্ত্রণা দিয়েছে ততটা যন্ত্রণা অপরাধীর ভাগ্যে জুটছে কিনা।

অনেকে, যেমন ম্যাকটাগার্ট → প্রতিহিংসা পরায়ন প্রতিকারের তত্ব।

১। দায়িত্ব সংক্রান্ত নীতি

২) সমতারক্ষার নীতি

৩) উচিত শোধবোধের নীতি

১। <u>দায়িত্ব সংক্রান্ত নীতি</u>- কাউকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে কেবল যদি সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন অপরাধ ঘটিয়ে থাকে।

ব্রাডলি এবং কান্ট- শাস্তি হল স্বরূপত- লক্ষ্য- end-in-itself। শাস্তি তোমার প্রাপ্য হয়েছে, অতএব, তমাকে শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি সমাজের কল্যান অথবা অপরাধীর চরিত্রের পরিবর্তনের উপায়, সেই কারণে প্রাপ্য নয়।

শাস্তির সঙ্গে অপরাধের নিবিড় সম্বন্ধ—

কুইন্টন→ সম্বন্ধটি যৌক্তিক। কল্পনা কর- কাউকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ঘোষণা করা হচ্ছে যে তাকে কোন বিশেষ কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতি বস্তুত অকল্পনীয়। এটাই প্রমাণ করে- শাস্তি ও অপরাধের সম্পর্ক অনুসৃতির।

ব্রাডলি এবং কান্ট- যৌক্তিক + নৈতিক।

--একজন সতিকারের অপরাধী জেনেশুনে তার নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করে বসে থাকে। তাই তাকে এ দায়িত্বভঙ্গের দায়িত্ব নিতে হয়। তাকে শাস্তি পেতে হয়।

২) সমতারক্ষার নীতি- চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।   শাস্তির তীব্রতা ≡ অপরাধের গুরুত্ব।

কিন্তু প্রতিটি শাস্তিদানের ক্ষেত্রে এরকম সমতা রক্ষার নীতি মেনে চলা সম্ভব? Kidnapping.

আবার প্রতিকারবাদী যদি চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত -এ নিয়মের সাহায্য না নিয়ে শাস্তি এবং অপরাধের মধ্যে সমতারক্ষায় উদ্যোগী হন তাহলে তার শাস্তিবিধান যাদৃচ্ছিক হবে।

এই উভয়সঙ্কট কান্ট এড়িয়ে গেছেন- বদলা নেওয়ার নিয়মটি শাস্তিবিধানের একমাত্র নিয়ম নয়। অপমানকর মন্তব্য করার অপরাধে অবমাননাকারীর আত্মগর্ব ভেঙ্গে দিয়ে, তাকে অবনত হতে বাধ্য করেও সমতা রক্ষা করা যায়।

৩) উচিত শোধবোধের নীতি – এ নীতি অনুসারে, অপরাধী যতটুকু ক্ষতির কারক হয়েছে, ততটুকু ক্ষতি তাকে ফিরিয়ে দিলে তবেই ন্যায়বিচার হয় এবং এই হল শাস্তিদানের যৌক্তিকতা।

প্রশ্ন ঃ ক্ষতির বদলে ক্ষতি ফিরিয়ে দেওয়া বা অকল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ ফিরিয়ে দেওয়া, এটা কি অর্থে ন্যায়বিচারের সুচক?

আসলে দুটি অকল্যাণ সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে কি এক এক করে দুটি অশুভ ঘটনা ঘটলে বা দুটি অকল্যাণ সৃষ্টি হলে তবেই কল্যান?

==

প্রতিরোধাত্মক শাস্তিতত্ত্ব ঃ

এই তত্ব প্রতিকারবাদীদের মত অতীতমুখী নয়।

প্রতিরোধবাদীরা ফলমুখী—শাস্তিদানের ফলে কি পাওয়া গেল, ব্যক্তির কী কল্যান হল, সমাজের কি কল্যাণ হল...

Bentham- Principles of penal law- শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সমাজের হিতসাধন।

--- মানুষের প্রতিটি কাজের মুলে আছে সুখাভিলাষা এবং দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা। অপরাধ করাটা যেহেতু একটা কাজ তাই এ কাজের মুলেও সুখবোধ ও দুঃখ বোধ থাকবে।

প্রতিটি অপরাধী তার অসামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে আসলে নিজের সুখ বাড়াতে চায়, নিজের দুঃখ মুক্তি ঘটাতে চায়।

শাস্তি অপরাধীর এরকম অভীপ্সাকে প্রতিরোধ করে→ মানুষ মাত্রই দুঃখ থেকে দূরে থাকতে চায়। সুতরাং, মানুষ যখন দেখে যে, কুকর্ম করার জন্যে একজন অপরাধীকে শাস্তি পেতে হচ্ছে, তখন তার নিজের মধ্যে অন্যায়ভাবে সুখভোগের প্রবণতা থাকলেও ঐ প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে সে যত্নবান হয়।

শাস্তিদানের সার্থকতা –অন্যায্য ভাবে সুখলাভের অভিপ্সা থেকে অধিকাংশ মানুষকে নিবৃত্ত করা গেলে সমাজের হিতসাধন হয়।

তাহলে প্রতিরোধবাদীদের মতে- শাস্তির দুই রকমের উদ্দেশ্য- ১) চূড়ান্ত -সমাজের সামগ্রিক হিতসাধন (২) সাক্ষাৎ - মানুষের নীতিহীন অভিপ্সার নিয়ন্ত্রণ।

বেন্থাম- প্রকৃত অপরাধীর কার্যকলাপ শাস্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় দুই ভাবে-

১) ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে অপরাধী নিজেকে সংযত করে তুলতে যত্নবান হয়। তার আত্মশুদ্ধি হয়।

২) অপরাধীর বাহুবলের ওপর নিয়ন্ত্রণ। এক্ষেত্রে অপরাধীকে অক্ষম বা অশক্ত করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই শাস্তিদানের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়।

যারা এখনও অপরাধ করেনি, তাদের ক্ষেত্রে শাস্তির প্রভাব পড়ে কেবলমাত্র তাদের ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়ের ওপর।

সুতরাং, প্রতিরোধবাদীদের মতে, শাস্তির ন্যায্যতা বা যৌক্তিকতা নির্ভর করে—

১) এ শাস্তির ফলে অপরাধীকে তার অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা যাবে কিনা এবং এ শাস্তির ফলে সে উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে কিনা,

২) এ শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক কিনা? অর্থাৎ, এ শাস্তির ফলে সমাজের অন্য সকলে এইরকম অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত হবে কিনা, এবং

৩) এ শাস্তির ফলে সমাজ এজাতীয় অপরাধীর হাথ থেকে রেহাই পাবে কিনা। মানে, শাস্তি এমন হওয়া চাই যাতে তার ফলস্বরুপ অপরাধী সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যাতে দেশের বা সমাজের নিরীহ মানুষজনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়।

কিন্তু এমন শাস্তি কি আছে?

১) এর গ্যারান্টি কোথায়? --একমাত্র মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু তখন ১) এর বাকি অংশ পূরণ হবে না।

---যাবজ্জীবন? সে ক্ষেত্রেও কারাগারের মধ্যে অপরাধ করতে পারে। তা ছাড়া, কারাবাস কি ব্যক্তিকে সত্যিকারের সামাজিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করে?

কিন্তু বেশীরভাগ অপরাধবিজ্ঞানীরা→ অপরাধীকে কারাগারে বন্দী রাখলে তার চিত্তশুদ্ধি হয়না।

তাছাড়া এই তত্বে একটি অসঙ্গতি-

অপরাধীকে তার ভবিষ্যৎ অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে হলে যে সামাজিক আদর্শে আস্থা রাখতে হয়- সামাজিক বিচ্ছিনতার মতাদর্শ;

অপরাধীকে সুস্থ সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে যে সামাজিক আদর্শ – সামাজিক বন্ধন।

----দুটো পরস্পর বিরোধী।

২) শর্তটিও বিভ্রান্তিকর।

প্রথমত, এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, একজনকে শাস্তি পেতে দেখলে অন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরাধ করা থেকে বিরত হবে।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি মাত্রই অপরাধী কে একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে ব্যাবহার করে।

কিন্তু কান্ট- প্রতিটি জীবন স্বতঃ মূল্যবান। বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন জীব মাত্রই স্বরুপত লক্ষ্য।

তৃতীয়ত, দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি মাত্রই ন্যায্য বলে গন্য হলে নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়াও ক্ষেত্রবিশেষে ন্যায্য বলে গন্য হয়ে যাবে।

৩) এটাও বিভ্রান্তিকর।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী ছাড়া সবাই একদিন ছাড়া পাবে।

তারপর কি এরা সুস্থ ভাবে সামাজিক জীবনযাপন করতে পারবেন?

সমাজ কি এদের স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করবে?

এদের উপস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকবে কি?

দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধের মুলে থাকে তাৎক্ষনিক চিত্তবিভ্রম। এই ক্ষেত্রে অপরাধের প্রবণতা থাকে না। তাই সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে কি এই রকম অপরাধী শাস্তির উর্ধে?

==

সংশোধনাত্মক শাস্তি তত্ত্ব

প্লেটো এবং হেগেল- মুল উদ্দেশ্য → অপরাধীর সংশোধন।

প্লেটোর পুনর্বাসন তত্ব- সংশোধন যেন এক অর্থে শাস্তি-অতিরিক্ত একটা ব্যাবস্থা, যা অপরাধীকে শাস্তি-অন্তে সুস্থ সমাজে পুনর্বাসন পেতে সাহায্য করে।

হেগেল- এমন এক সংশোধন যা শাস্তিভোগের মধ্যেদিয়েই হয়ে যায়- অপরাধীর চিত্তশুদ্ধির ব্যাবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকে।

<u>হেগেল</u>- Philosophy of Right- একমাত্র শাস্তি পাওয়ার সুত্রেই সংশোধন অপরাধীর প্রাপ্য হয়।

অপরাধীর পাপ- কোন না কোন নৈতিক বিধি লঙ্ঘন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র শাস্তির মাধ্যমে সম্ভব→ এতে অপরাধী নিজের অন্যায় বুঝতে পারে আর তার মধ্যে অনুশোচনার উদয় হয়→ এতে চিত্ত শুদ্ধি হয় আর সে নিজেকে ফিরে পায়।

---সাধারণত, পুনর্বাসনমুলক শাস্তিতত্ত্বে এই ইঙ্গিত থাকে যে অপরাধীর শাস্তিভোগ চলতে থাকার সময় আমাদের কর্তব্য হল তাকে সংশোধন করা।

কিন্তু হেগেল→ ন্যায্য শাস্তির স্বরূপই এমন যে, এ শাস্তিভোগের মধ্যে দিয়েই অপরাধীর আত্ম-সংশোধন।

পুনর্বাসনবাদী→ শাস্তি বিস্বাদ ওষুধের মত, যা উপায়ের অভাবে অপরাধীর ওপরে প্রয়োগ করতে হয়।

কিন্ত হেগেল→ শাস্তি অপরাধীর পক্ষে আশীর্বাদ। কারণ, এ শাস্তি না পেলে সে তার স্বভাবগত নীতি বোধ থেকে বিচ্যুত থেকে যেত। শাস্তি মানুষের আত্ম শুদ্ধির অধিকার।

<u>প্লেটো</u>- অপরাধী মাত্রই নৈতিক দিক থেকে অসুস্থ। তাই অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব হল অপরাধীর মানসিক চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা।

প্লেটোর মূল বক্তব্য-

১) অপরাধপ্রবণতা এক ধরণের মানসিক রোগ- ব্যক্তিসত্তা বিলোপের কারণ।

২) শাস্তি মাত্রই এক ধরণের নৈতিক ওষুধ- বিস্বাদ কিন্তু স্বাস্থ্যকর।

৩) রাষ্ট্র এবং অপরাধীর মধ্যে সম্বন্ধটি হওয়া উচিত প্রতিপালক- প্রতিপালিতের সম্বন্ধ।

এই মতবাদে অপরাধীকে উপায়রূপে গন্য না করে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যরূপেই গন্য করা হয়।

তাই, প্রাণদণ্ড সমর্থিত নয়।

সংশোধনাত্মক মতবাদীদের মতে, মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করেই অপরাধীকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তার নৈতিক উৎকর্ষ সাধন, দৈহিক যন্ত্রনা দিয়ে নয়।---কারাগের আটকে রেখে অথবা নিঃসঙ্গ রেখে।

সমালোচনা –

১) চরম অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড না দিলে নৈতিক নিয়মের মর্যাদা থাকে না। এরা সমাজের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হতে পারে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও সমাজের উপকারের জন্যে- মৃত্যুদণ্ড।

২) এই মতবাদে- যারা দেশের বিধিবদ্ধ দণ্ডনীতি অগ্রাহ্য করে তাদের অপরাধ এবংযারা প্রথাসিদ্ধ লোকাচার অগ্রাহ্য করে তাদের অপরাধ যেন গুনগতভাবে অভিন্ন। এরা সকলই সামাজিক ব্যাধির শিকার, তাই এদের সকলেরই শাস্তির রূপ হবে সংশোধনাত্মক।

কিন্তু পুনর্বাসন সবার প্রাপ্য নয়।